লঙ্গরখানা

দুর্ভিক্ষের গল্প সংকলন

বেলাল চৌধুরী

সম্পাদিত

ঐতিহ্য

পঞ্চাশের মন্বন্তরে ক্ষুধার
সত্যিকারের ইতিহাস যাঁরা
লিখে গেছেন সেইসব বাঙালি
লেখকদের উদ্দেশে

ভূ মি কা

দুর্ভিক্ষের পঞ্চাশ বছর পরে আবার দুর্ভিক্ষের গল্প কেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে চোখের সামনে আবার সেই কঙ্কালের মিছিল ফিরিয়ে আনা, শবে শবে আকীর্ণ রাজপথের দৃশ্যাবলি তুলে ধরা, আবার সেই 'ফ্যান দাও' আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলা, এ কি এক ধরনের দুঃখবিলাস নয়? ইতোমধ্যে আমরা অর্ধশতক পেছনে ফেলে এসেছি। মন্বন্তরের সঙ্গে রচিত হয়েছে দুই প্রজন্মের ব্যবধান, সুতরাং এ সময়ে নতুন করে আবার হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসা কি এতই জরুরি ছিল? সরাসরি না হলেও অনেকের মনে এসব প্রশ্ন উঠতে পারে। বিত্তবানদের কথা বাদই দিচ্ছি, কারণ বাংলার তেরোশো পঞ্চাশ তাঁদের পক্ষে এক অস্বস্তিকর স্মৃতি। মানুষের তৈরি সেই মহামন্বন্তরে বিদেশি শাসকদের মতো স্বদেশি মুদ্রারাক্ষস শ্রেষ্ঠী আর কালোবাজারির দলও সেদিন খুনির ভূমিকায়। যাঁরা মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ যাঁরা বিত্তহীন হয়েও সুখ দুঃখ নিয়ে কোনো মতে জীবনের রসদ খুঁজে নিচ্ছেন এই অসম সমাজে, তাঁরাও পঞ্চাশ বছর আগেকার মন্বন্তরের হাহাকারময় দিনগুলোর কথা শুনতে রাজি না হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নানা সমস্যায় পীড়িত দৈনন্দিনতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট গৃহস্থ মধ্যবিত্ত স্বভাবতই অতীতের দুঃখময় জীবনের কাহিনি শুনে আপন যন্ত্রণাকে আর বাড়াতে না চাইলে, তাঁদের বোধহয় খুব দোষ দেওয়া যায় না। নির্মম নিষ্ঠুর সত্য, রূঢ় বাস্তবের চেয়ে তাঁদের অনেকেরই ঝোঁক অতএব ইচ্ছাপূরণের গল্পের দিকেই। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের দিকে তাকালেই তাঁদের পছন্দ অপছন্দের কিছুটা আভাস মেলে। তদুপরি অধুনা এই উপমহাদেশে ভোগবাদী জীবনদর্শনের জয়জয়কার। 'বাজার, বাজার' করে চারদিক সরগরম। টিভিতে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে রচিত হচ্ছে সুখের এক রঙিন বেহেশত, দিশেহারা মধ্যবিত্ত ছুটছেন সেদিকে। এ সময়ে লঙ্গরখানা, কঙ্কালের মিছিল, মৃত্যুর মহোৎসবের কথা কে আর শুনতে ভালোবাসেন?

তবু শোনাতে হচ্ছে। কারণ, তেরোশো পঞ্চাশ বাঙালি নামক জাতির আত্মকথারই একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। দুঃখের, অপমানের, লজ্জার। সেই বিষাদসিন্ধুর কথা ভুলে গেলে ক্ষুধা এবং মহামারিতে মৃত ত্রিশ লক্ষ নারী পুরুষ শিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। আমার বিচারে অপমান করা হয় সেদিনের বাঙালি কবি লেখক শিল্পীদের স্মৃতিকেও। আমরা তাঁদের হৃদয়ের ক্ষত চিরকাল বহন করে

চলব বলেই না সেদিন এমন করে কলমে, তুলিতে নিজেদের মানবতাবোধকে উজাড় করে দিয়েছিলেন ওঁরা। এই উত্তরাধিকার কি আমরা বিস্মৃত হব?

এটা ঠিক, 'তেরোশো পঞ্চাশ' স্বাধীনতার পর আর কখনো সেই ভয়াল করাল চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি। তবে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আমাদের কোনো চাক্ষুষ পরিচয় নেই, এমন কথাও বলতে পারি না। ইথিওপিয়া, সুদান, সোমালিয়া – আফ্রিকার মানুষ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মরেন, তখন আমরা 'তেরোশো পঞ্চাশের' কথা স্মরণ না করে পারি না। কাগজে কাগজে কিংবা টেলিভিশনে ছবি যখন দেখি তখন শিউরে উঠে ভাবি এইসব কঙ্কাল কি আমাদের অনাত্মীয়? তেরোশো পঞ্চাশে আমাদের অন্য প্রজন্মের মানুষ কি এভাবেই ক্ষুধার শিকার হননি? আমরা যাঁরা বাংলাদেশের বাসিন্দা ১৯৭৪-এ একবার তেরোশো পঞ্চাশের মতোই ক্ষুধার সেই হানাদারি প্রত্যক্ষ করেছি। তার পটভূমিতে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন এবং বর্বর আক্রমণের পর সদ্য স্বাধীন জাতিকে ভাতে মারার জন্য আন্তর্জাতিক এক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হয়েছিলেন বাংলাদেশের গর্বিত মানুষ। অনেকটা তেরোশো পঞ্চাশেরই প্রতিচ্ছবি যেন। সেবার ছিল বিদেশি শাসকদের ষড়যন্ত্র। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, ইংরেজ তার রাজত্ব শুরু করেছিল ১১৭৬-এর মন্বন্তর দিয়ে, অন্তিম পর্বে তার উপহার–তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর। বলতে গেলে বেয়াল্লিশের আন্দোলনের পরোক্ষ জবাব ছিল সেই মহামন্বন্তর। ১৯৭৪-এর বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ তেমনই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যকে কলঙ্কিত করার জন্য নিষ্ঠুর আঘাত। বাংলাদেশের বাঙালি অবশ্য সেই আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যাননি। কারণ, দেশে তখন নিজেদের সরকার। সেদিনের দৃশ্যাবলির কথা বাদ দিলেও এ কথা মানতেই হবে, সীমান্তের এপারে ওপারে দুই বাংলাতেই অসংখ্য মানুষ এখনও ক্ষুধাপীড়িত। অশিক্ষা, অপুষ্টি, ক্ষুধা এবং আধিব্যাধি এখনও অগণিত মানুষের জীবনে ছায়ার মতো সঙ্গী। সুতরাং, তেরোশো পঞ্চাশকে আমরা ভুলি কেমন করে? কলকাতা বা ঢাকার পথে যে দরিদ্র মানুষদের আমরা নিয়ত দেখি গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে যে দুঃখী মানুষকে নিয়ে আমরা ছয় ঋতু বারো মাস ঘর করি তাঁদের কথা ভুলে থাকা আর সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকা নিছক সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার সামিল। সামাজিক মানুষ হিসেবে অতএব তেরোশো পঞ্চাশকে আমরা কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না, এড়িয়ে যেতে পারি না বাঙালির ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়টি। আর ভুলবই বা কেন? বিশেষত এই তেরোশো পঞ্চাশ উপলক্ষে আমরা দেখেছি বাঙালি শিল্পী সাহিত্যিকদের অন্য মুখ। সে মুখ একদিকে দুঃখে কাতর, অন্যদিকে মানবিকতায় উজ্জ্বল। সে চোখে অশ্রুর বন্যা, একই সঙ্গে ক্রোধের আগুন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং চিত্রকলায় সৃজনশীল বাঙালির বিবেকের এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ সেদিন। বাঙালির ইতিহাসে তেরোশো পঞ্চাশের মতো অশ্রুনদী আধুনিককালে আর কখনো বয়ে যেতে দেখা যায়নি। কান্না ভেজা মাটিতে শিল্প সাহিত্যের এমন সোনালি ফসলও আমরা আর কখনো পাইনি। বস্তুত, আমার তো মনে হয় না বিশেষ কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে

পৃথিবীর আর কোথাও কোনো ভাষায় সৃজনের এমন কোনো প্রস্রবণ দেখা গেছে। যুদ্ধে বা বিপ্লবে কিছু পাওয়ার কাহিনি থাকে। থাকে জয় পরাজয়ের খতিয়ান। শিল্প সাহিত্যে নিশ্চয়ই তার ছায়াপাত ঘটে। কিন্তু তেরোশো পঞ্চাশে আমাদের যা কিছু প্রাপ্তি সবই যেন প্রত্যাশার বাইরে। মৃত্যুলোকে সে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের এক অবিশ্বাস্য কাহিনি। তুলনাহীন বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার শিল্পকলার সেই ঐতিহ্য।

তেরোশো পঞ্চাশের পটভূমিতে উপন্যাস অবশ্য লেখা হয়েছে অনুপাতে কম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর', গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস, 'পঞ্চাশের পর', 'ঊনপঞ্চাশী' এবং '১৩৫০'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামনি'; প্রবোধকুমার সান্ন্যালের 'বনহংসী'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সঙ্কেত'; ভবানী ভট্টাচার্যের 'কাজলী' ইত্যাদি। অবশ্য সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' এবং আরও কোনো সমকালের উপন্যাসেও যুদ্ধ ও মন্বন্তর পরিবেশ-পরিস্থিতি রচনায় সহায়ক হয়েছে। এমনকি মন্বন্তরের বাইশ বছর পরে লেখা শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসেও মন্বন্তর পীড়িত গ্রামবাংলা ঠাঁই পেয়েছে কাহিনির প্রয়োজনে। হয়তো আরও অনেক উপন্যাসেই। আবু ইসহাক-এর সুপরিচিত উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী' মন্বন্তরের এক যুগ পরে লেখা, কিন্তু সে কাহিনিও শুরু হয়েছে শহরে সব হারিয়ে গ্রামে ফিরে আসা পরাজিত মানুষদের নিয়ে। সত্য বলতে কি, চল্লিশের পর বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ আর মন্বন্তরের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি অনেক লেখকই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্যে একটা ঘোরতর রূপান্তর আসন্ন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। ... অতীতের সকল বিশ্বাস সকল প্রত্যাশা আজ আমাদের শিথিল হয়ে গেছে। এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতম বীভৎসতার এই পটভূমিতে উলঙ্গ বাস্তব সত্যের সঙ্গে, আমরা দাঁড়িয়েছি। ....বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন দর্শনের যে মহাপরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, তার ফলে পুরাতন জীবনাদর্শে বা জীবন ভাবনায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়।" সেই নতুন সাহিত্যের ভূমিকা শুধু নয়, পথ নির্দেশও মিলেছিল চল্লিশের দশকের এই সাহিত্যে, জন্ম যার ধ্বংস এবং মৃত্যুর দগ্ধ উপত্যকায়।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্প রচিত হয়েছে অবশ্য অনেক বেশি। কবিতার মতো ছোট গল্পেও বাঙালি লেখকদের সাধনা ও সিদ্ধি চিরস্বীকৃত। তেরোশো পঞ্চাশে কত গল্পই না লিখেছেন আমাদের প্রধান, অপ্রধান, খ্যাত, স্বল্পখ্যাত, অখ্যাত লেখকরা। তারাশঙ্করের 'তিনশূন্য', 'ইস্কাপন', 'মরামাটি', 'বোবা কান্না'–অসাধারণ সব গল্প। তবু বুঝিবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং প্রখর গল্প লেখক। 'আজকাল পরশু-র গল্প', 'পরিস্থিতি', 'ছোটোবড়ো'–এ সব সঙ্কলনের অনেক গল্পই তেরোশো পঞ্চাশের ক্ষুধার্ত অপমানিত, নানাভাবেই অত্যাচারিত মানুষের গল্প। যেসব গল্পে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এমনকি প্রতিশোধের স্পৃহা এবং সংকল্পও অনুপস্থিত নয়। পড়তে পড়তে খেদ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষের গল্পগুলোকে নিয়েই কেন একটি সংকলন তৈরি হলো না আজও। তেরোশো পঞ্চাশ বাংলার গ্রামকেই শুধু ধ্বংস করেনি, তছনছ করে দিয়ে

গেছে আমাদের সমস্ত মূল্যবোধ, গ্রামের সঙ্গে নগরের, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, মায়ের সঙ্গে সন্তানের, —মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে অমানবিকতার এক নতুন মাপকাঠিতে। মানুষ নামতে নামতে অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, আবার কখনো কখনো সেই অন্ধকারেই ঝলসে উঠেছে মানবিকতার উজ্জ্বল আলোয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এই আলো অন্ধকার, আবার এই দুইয়ের মাঝামাঝি হাফটোন ছবির মতন যে স্তরভেদ সবই ধরা পড়েছে নির্ভুলভাবে। একটি গল্পে দেখি শহুরে মধ্যবিত্ত মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে শরণার্থীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'গ্রাম থেকে এইছি, খেতে পাইনি বাবা।' এই মৃত্যুঞ্জয় এক সময় মনে হয় যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। নিরন্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম তিনি।

অনেক গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কালনাগ', 'হাড়', 'চিতা', 'কাক', 'বস্ত্র' ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও মন্বন্তরের অন্যতম দলিল লেখক। 'নক্রচরিত', 'তীর্থযাত্রা', 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'আবুখলিফার শেষ খন',–কোনো গল্পই সাজানো নয়। প্রতিটি গল্প হৃদয় নিঙড়ানো। তাছাড়া মনোজ বসু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, মহীউদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ–কে না লিখেছেন তেরোশো পঞ্চাশের গল্প! কাকে বাদ দিয়ে সঙ্কলনে কাকে রাখি, একই লেখকের পাঁচটি-দশটি গল্প থেকে কোনটিকে বেছে নিই, ভেবে ভেবে হয়রান হই। যতই ভাবি এক খণ্ডে কিছুতেই আমার 'লঙ্গরখানা' গোটাতে পারি না। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন বিশিষ্ট লেখকরা। কারও নামই অবহেলা করার মতো নয়। প্রত্যেকেই তাঁরা আজও সশ্রদ্ধায় পাঠ্য। বক্তব্যে প্রত্যেকেই তাৎপর্যময়। সুতরাং কমপক্ষে দুটি খণ্ড না হলে না মন তৃপ্ত হয়, না যথাযথভাবে পালন করা হয় কর্তব্য। অতএব সংকলন বিস্তার করতে হলো দুই খণ্ডে। আপাতত প্রথম খণ্ড সম্পর্কে কিছু কথা।

মন্বন্তর নিয়ে প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশ করেন পরিমল গোস্বামী। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'মহামন্বন্তর' নামে সেই সংকলনটিতে গল্প ছিল এক ডজন। বলতে গেলে মন্বন্তর চলাকালীন সঙ্কলনের উদ্যোগ। ফলে অনেক বিশিষ্ট গল্পকারই বাদ পড়েছিলেন সংকলন থেকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, রমেশচন্দ্র সেনের মতো লেখকেরাও দেখি অনুপস্থিত। অন্য দিকে কারও কারও গল্প ছিল একাধিক। পরিমল গোস্বামী নিজের এবং সরোজ রায়চৌধুরীর গল্প দুটি করে। আমি এই খণ্ডে এক এক জন লেখকের একটি করে গল্পই দিয়েছি। আবুল মনসুর আহমদ, মহীউদ্দিন প্রমুখ লেখকদের লেখা দুর্ভিক্ষের গল্প সম্ভবত অনেকের কাছেই ছিল অজানা। এঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমি অবশ্যই আনন্দিত। এই সঙ্কলনে কমলকুমার মজুমদারের 'খেলার প্রতিভা' থেকে কটি পৃষ্ঠা গল্প আকারে ছাপা হলো। 'খেলার প্রতিভা' আসলে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় মন্বন্তরের অনেক বছর পরে,

বছর বারো তেরো আগে কলকাতার একটি সাময়িক পত্রে। সেই পত্রিকার কিছু সংখ্যাই 'বই' হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে কমলকুমার মজুমদারের এই উপন্যাস বলতে গেলে এখনও 'অপ্রকাশিত'। কমলকুমারের লেখা 'নিমঅন্নপূর্ণা'র মতো গল্পে দারিদ্র্য ক্ষুধা এবং তার ফলে মানুষের বিশ্বাস ও চিরাচরিত মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কাহিনি আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। 'খেলার প্রতিভা'র প্রথম কয়টি পৃষ্ঠায় আমরা সেই সংবেদী দর্শক এবং নিপুণ চিত্রকর কমলকুমার মজুমদারেরই লেখা পাই। অন্নহীন মানুষ গ্রাম থেকে শহরের দিকে দলবেঁধে চলেছেন এই দৃশ্য কমলকুমার যেভাবে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া বার। এই সংকলনে জগদীশ গুপ্তের 'চার পয়সায় এক আনা' নামে যে গল্পটি আমি যোগ করেছি, সেটি ঠিক মন্বন্তর-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ, গল্পটি বেশ কয়েক বছর পরে লেখা। তবু আমি এই গল্পটি সংকলনে ঠাঁই দিয়েছি। এ কথাটাই মনে করিয়ে দিতে যে, গরিবি, ক্ষুধা এবং জীবন যন্ত্রণা বাঙালির ঘরে শুধু ঘটা করে মন্বন্তর দিনেই হানা দেয় না, যুগ থেকে যুগান্তরে অনেক সংসারেই গৃহস্থের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সীমাহীন দারিদ্র্যের সহবাস।

তেরোশো' পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে গবেষকেরা অনেক আলোচনা গবেষণা করেছেন। অনেকেই চেষ্টা করেছেন মন্বন্তরের পটভূমি ব্যাখ্যার। কেউ কেউ তার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের। একালেও অনেকে আলোচনা, গবেষণা করছেন। অমর্ত্য সেন থেকে মার্কিন গবেষক পল গ্রিনো, তেরোশো পঞ্চাশের রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন অনেকেই। আশ্চর্য এই, তাঁরা কিন্তু তেরোশো পঞ্চাশ উপলক্ষে রচিত বাংলা সাহিত্য শিল্পের প্রতি তাকানো জরুরি মনে করেননি। অথচ চল্লিশের দশকের শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত—সবই কিন্তু ওই কঙ্কাল স্তূপের মতো, বলতে গেলে মন্বন্তরেরই ফসল। অর্থনীতি কিংবা পরিসংখ্যানবিদরা না হয় তথ্যের কারবারি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকার কিংবা বিচারকরাও কি সমানভাবে নিরাশ করেননি আমাদের? বাংলা সাহিত্যে একই বিষয় নিয়ে গবেষণা পত্রের পর গবেষণাপত্র রচিত হয়, ছক বাঁধা কতকগুলো বিষয়ের প্রতি প্রায়শ আকৃষ্ট হন আমাদের গবেষকরা, কিন্তু কী আশ্চর্য, তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ্যে রচিত ওই ঐশ্বর্য নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণার উদ্যোগ দেখা গেল না কোথাও। অধুনা কেউ কেউ অবশ্য মন্বন্তরের শিল্প সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু চর্চা করেছেন। কিন্তু চল্লিশের দশকের ওই দগ্ধ, বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত বাংলার পটভূমিতে রচিত যে বিপুল সাহিত্য সম্ভার, তাকে স্বতন্ত্র বন্ধনীভুক্তি করে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন না কেউ। অথচ আমার মতো একজন সাধারণ সাহিত্য পাঠকেরও গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এই সাহিত্য চরিত্রে এবং লক্ষে পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য থেকে স্পষ্টতই অন্যরকম। তারাশঙ্কর যাকে বলেছেন, 'নতুন সাহিত্য'। এই কঠোর সমাজ বাস্তবতার উৎস কোথায়, তার সঙ্গে পশ্চিমের বাস্তববাদী সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহ, কিংবা

বাংলায় সাম্যবাদী আন্দোলন–ইত্যাদির কি কোনো সম্পর্ক ছিল? প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব? নাকি উৎসমুখ অন্যত্র? দ্বিতীয়ত, এই সাহিত্য লক্ষেও কি আগেকার সাহিত্য থেকে অনেক বেশি জনমুখী নয়? এই সাহিত্য শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ শুধু তাই নয়, ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আস্থাহীনতারও বোধহয় দ্যোতক। এখানে মানুষ এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে মানুষই শেষ কথা। এ সাহিত্যে শব সাধনা নয়, জীবনের সাধনা। আমার তো মনে হয় পরবর্তী যে বাংলা সাহিত্য তার প্রধান ধারাটি এই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে। এমনকি আজও।

অথচ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচকরা গতানুগতিক ইতিহাস রচনা করেই কর্তব্য শেষ করেছেন। যাঁরা গতানুগতিকতার বাইরে নতুনভাবে সাহিত্য বিচারে এগিয়ে এসেছেন বলে দাবি করা হয়, তাঁরাও কিন্তু আরেক ধরনের গতানুগতিকতারই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ছক বাঁধা রাজনৈতিক তত্ত্ব আর দলীয় সম্পর্কই অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করেছে যেন তাঁদের বিচার বোধ। অথচ তেরোশো পঞ্চাশের সাহিত্যের দাবি ছিল বোধহয় অন্যরকম। মতাদর্শ ঘটিত বিরোধ, গোষ্ঠীগত তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সৃজনশীল বাঙালির আত্মাকে উপলব্ধি করা। মন্বন্তরের ইতিহাস লেখকেরা এদিকে তাকাননি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরাও এক অর্থে যথাযথভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারলেন না। অথচ তেরোশো পঞ্চাশের উপন্যাস বা গল্প ছিল ঐতিহাসিকের পক্ষে যেমন জরুরি, সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের পক্ষে তার চেয়ে বেশি জরুরি। পরিমল গোস্বামী তাঁর গল্প সংকলনের ভূমিকায় লিখেছিলেন–"বাংলার বুকে একদিন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল। সে কথা বাংলার ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। কী কারণে এই প্রলয় ঘটেছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই বর্ণনায় ভবিষ্যতের লোকের কাছে আজকের এই প্রলয়চিত্র কখনো জীবন্ত হয়ে উঠবে না। উঠবে এই গল্পগুলোর ভিতর দিয়েই।" ওই সঙ্কলনের ভূমিকাতেই গোপাল হালদার মন্তব্য করেছিলেন, "আসলে এই মন্বন্তরের সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার স্বাক্ষর থাকবেই।" এই সত্যকে সশ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েই মন্বন্তরের পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগ এক অর্থে ইতিহাসের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য। সমালোচক এবং সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের একটি বিশেষ অসম্পূর্ণতার কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৩ বেলাল চৌধুরী

গ ল্প সূ চি

ইস্কাপন ১৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বাঁচায়, কে বাঁচে ৩০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালনাগ ৩৬
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নয়নচারা ৪৩
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

নক্র-চরিত ৫১
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেত ৬৬
রমেশচন্দ্র সেন

ক্ষুধার দেশের যাত্রী ৮১
সরোজকুমার রায়চৌধুরী

নিমন্ত্রণ ৯০
মনোজ বসু

শেষের হিসাব ১০১
পরিমল গোস্বামী

লঙ্গরখানা ১০৫
আবুল মনসুর আহমদ

কতটুকু ক্ষতি ১২১
সুবোধ ঘোষ

১৯৪৩ ১২৮
সোমনাথ লাহিড়ী

ধানকানা ১৫৪
ননী ভৌমিক

কল্কি ১৬৪
নবেন্দু ঘোষ ১৬৪

খুনি ১৮১
সুশীল জানা

খেলার প্রতিভা ১৯৩
কমলকুমার মজুমদার

চার পয়সায় এক আনা ২১৪
জগদীশ গুপ্ত

দুর্ভিক্ষ ২২৫
মহীউদ্দিন

লেখক পরিচিতি ২৩৪

ইস্কাপন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'ইস্কাতন' অর্থাৎ 'ইস্কাপন' কোনো নাম হয় না। কিন্তু চকচকে কালো রং আর চাকামতো মুখের ঢং–এই দুটোর জন্যে ওর ইস্কাপন নামটা মনে হয় না যে অসংগত, বরং 'ইস্কাতন' বলে ডাকলে ও যখন সামনে আসে– তখন মনে হয় – বাঃ, চমৎকার মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে তো। যে নাম দিয়েছিল–তার রসবোধের এবং সেই বোধ প্রকাশের শক্তির তারিফ করতে হয় মনে মনে। কিন্তু সে রসিকজন যে কে–সে কেউ বলতে পারেনি। ইস্কাপনের বয়সই হলো চল্লিশের ওপর। ছেলেবেলা থেকেই সে ইস্কাপন,... ওই এক এবং অদ্বিতীয় নামেই সে পৃথিবীতে পরিচিত। তার বন্ধুবান্ধবে বলে– 'ইস্কাতন'। থানায় ইতিহাসের যে পাকা খাতা–তাতেও লেখা আছে– 'ইস্কাপন'। 'পিতা অজ্ঞাত, জাতি অজ্ঞাত, নিবাস অজ্ঞাত, ভীষণ প্রকৃতির লোক। কথায় কথায় মারপিট করে, দুর্দান্ত মাতাল, বেশ্যাসক্ত; চোর। স্থানীয় মাহোড়া গ্যাং-এর (gang – ডাকাতের দল) সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। অন্তত এই গ্যাং এখান হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী সদর থানায় এলাকাভুক্ত তারাপুর গ্রামে যে ডাকাতি করিয়াছিল, সে ডাকাতিতে মোটর বাস ব্যবহারের যে অসমর্থিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে ইস্কাপন যুক্ত ছিল। মোটর বাসের ক্লিনার সে। লাইসেন্স না থাকিলেও ড্রাইভিং জানে। সন্দেহ হয় সেই মোটর বাস ড্রাইভিং করিয়াছিল।'

তেরোশো পঞ্চাশ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস।

'ইস্কাপন' জেল থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় আট মাস পর। তেরোশো ঊনপঞ্চাশের সপ্তমী পূজার দিন দুপুরবেলা থেকে যে কাল-ঝড় আরম্ভ হয়েছিল, সেই ঝড়ের রাত্রে ইস্কাপন বেরিয়েছিল চুরি করতে। অবশ্য তখন কি কেউ বুঝেছিল যে, ঝড় নয় প্রলয়? বাদলা, আকাশজোড়া মেঘের অন্ধকার, রিমিঝিমি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বুনো শুয়োরের মতো গোঁ গোঁ করে বাতাসের

দমকা; চুরির পক্ষে এমন রাত্রি আর হয় না। তার ওপর পটলির মুখ ভার। দোকানে সে কী-একটা শাড়ি দেখে এসেছিল-দাম তার কুড়ি টাকা। সেখানা নইলে তার মন উঠছিল না কিছুতেই। কাপড়খানা অবশ্য বাহারের কাপড়। যে জিনিস ইস্কাপনের খুব ভালো লাগে সে জিনিসকে সে বলে মনমোহিনী; কাপড়খানা মনোমোহিনী বটে। মদের নেশায় শরীরে, মনে বেশ চনচনে ভাব এসেছিল। সে হঠাৎ উঠে গান ধরেছিল–ও আমার ঘেঁটুনির মন হলো ভারী, লতুন কাপড় লইলে যাবে না শ্বশুরবাড়ি। 'আচ্ছা চললাম আমি। একটুকুন হাস দেখি!'

পটলিও ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

ইস্কাপন কাজ ঠিক সেরেছিল। দু-ক্রোশ দূরের মণি চন্দর বাড়ি ঢুকে ঠিক হাতবাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ধরা পড়বার কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু তখন বুনো শুয়োর শেলেদা বাঘ হয়ে উঠেছে, ঝড় তখন মেতেছে, একা পবন তখন ঊনপঞ্চাশ ধারায় বইছে। জলের জোরও বেড়েছে। গাছে লাগছে– যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সুচ এসে বিঁধছে। খানিকটা আসতেই হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কনকনিয়ে উঠেছিল। একটু বিশ্রামের জন্যে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের তলায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই মড়মড় করে ভেঙে পড়ল একটা ডাল, সেটা চাপা পড়লে ইস্কাপন তুরুপ হয়ে যেত, মরেই যেত সে। কিন্তু ভাগ্য ভালো, সরাসরি গোড়াচাপা না পড়ে পত্রপল্লববহুল ডগার দিকটার ঝাপটা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে, পাতাচাপা পড়েছিল। আসলে মণি চন্দর কপালটাই পাতাচাপা আর ইস্কাপনের কপালটা যাকে বলে পাথরচাপা; তা-ই সকালেই সেই দুর্যোগের মধ্যেও থানায় খবর দিতে যাবার পথেই মণি ফিরে পেল তার বাক্স, আর পাতাচাপা পড়ে বেঁচে ইস্কাপন পড়ল ধরা।

অতঃপর পুলিশের হেফাজতির মধ্যে জেল হাসপাতাল। সে প্রায় মাসখানেকের ওপর। তার বিচার। তারপর ছ-মাস জেল।

জেল মন্দ জায়গা নয়, শরীর সারে, কিন্তু প্রথমেই এই যে হাসপাতালে এক মাস পড়েছিল, তাতেই ইস্কাপনকে ভেঙে দিয়েছিল। তবুও সে মনে মনে ভাগ্যকে মানে যে, ভাগ্যে এই হাসপাতালে এসে পড়েছিল সে তা না হলে পটলি হয়তো শাড়ি পরত কিন্তু তাকে পটোল তুলতে হতো অবধারিত। যাক, সে ভাঙা শরীর আর তার জোড়া লাগল না। কাঁধের হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠে পড়েছে, ঢাকা মুখের পুরন্ত গালও চড়িয়ে যেন ভেঙে দিয়েছে। জেলে গোপনে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা ভাঙা আয়নার টুকরোয় নিজের চেহারা দেখে সে আপন মনেই দুঃখের হাসি হেসে রসিকতা করে যা বলত তা-ই বললে সে গাঁয়ে পা দিয়েই। সে গাঁয়ে ঢুকছে– আর নোটন চৌকিদার বেরুচ্ছে। নোটনের পেছনে

ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারিবাবু। নোটন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল—ইস্কাতন? আহা-হা, এ কী চেহারা হয়েছে রে?

ইস্কাপন হেসে বললে—ভেঙে চিড়িতন করে দিয়েছে ভাই। তারপরে তোমাদের সব ভালো তো? সেক্রেটারিবাবু ভালো আছেন?

সেক্রেটারি সংক্ষেপে জবাব দিয়ে এগিয়ে গেল। চৈত্রে বছর শেষ হয়েছে, বাকি ট্যাক্স অস্থাবর করে আদায়ের পালা; মেজাজটা তার রুক্ষ হয়েই আছে। তার ওপর কোথা থেকে এল বেটা চোর, বেটার মুখ দেখে যাত্রার ফলে যে কী কপালে আছে কে জানে! আবার ওর ট্যাক্স আদায়েরও হাঙ্গামা বাড়ল। জেলে ছিল, পড়ে ছিল ভাঙা ফুটো ঘরখানা, স্বচ্ছন্দে রেহাই পড়ত বেটার ট্যাক্স অনুপস্থিতির অজুহাতে। বেটা এল ঠিক সময়টিতে; এইবার যেতে হবে ওর দরজা ছাড়াতে। তার ওপর চোর ফিরল—হাঙ্গামা বাড়ল।

নোটন পিছিয়েই ছিল ইচ্ছা করে। সেক্রেটারি ডাকলে—আয় রে নোটনা!

এই যা-হ আজ্ঞে। যেতে যেতেই সে অকৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে মৃদুস্বরে বললে, পটলি মরে গিয়েছে রে!

মরে গিয়েছে?

হ্যাঁ—বড়ো কষ্ট পেয়ে-

সেক্রেটারি ডাকলে—নোটন!

এই যে আজ্ঞে। ঘা হয়েছিল দূষি ঘা।

নোটনা!

নোটন আর দাঁড়াতে পারলে না। ছুটে যেতে হলো তাকে। ইস্কাপন দাঁড়িয়ে রইল। পটলি মরে গেছে। সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে —দূষিত ঘা হয়ে মরে গেছে? হঠাৎ তার কানে এল সেক্রেটারি নোটনকে বলছে—ও বেটাও জেলে মরলে যে ভালো হতো।

অন্য সময় হলে ইস্কাপন গর্জন করে উঠত। কিন্তু আজ তার মুখে কোনো কথা ফুটল না। পটলির মৃত্যুর দুঃখের ওপরেও সে আরও দুঃখ পেলে। সে মরে গেলে ভালো হতো!

ইস্কাপনের যেন কিছুক্ষণের জন্য হুঁশ রইল না। গ্রামে ঢুকতেই এমন দুঃসংবাদ আর এই দুঃখ পেয়ে মন তার কেমন হয়ে গেল। পটলি মরে গিয়েছে? তবে? কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে? এতটা পথ সে কেবল পটলির কথাই ভাবতে ভাবতে আসছে। নানারকম ভাবনা। জেল থেকে বেরিয়েই মনে হয়েছিল তার—পটলি তার জন্যে ভেবে, তার অভাবে না-খেতে পেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে; যে কখানা সোনা রুপোর টুকরো তার গায়ে ছিল, তার আর

কিছুই নাই; পরনে ছেঁড়া ফড়িঙের মতো নাচত—তা আর নাচে না, তার বদলে চোখের তারা দুটো হয়ে গেছে মরা ফড়িঙের মতো। ইস্কাপনকে দেখে যে ঝরঝর করে কাঁদবে!

কিছুক্ষণ পর নিজেই সে হেসে আপন মনে বলেছিল—হুঁ। বার বার ঘাড় নেড়েছিল অস্বীকারের ভঙ্গিতে।—পটলি তো। সেই পটলি। যে পথ চলে হেলেদুলে, যেন নেচে চলে; যে কথা কয় পিচ কেটে, মানুষের মনকে কেটে যেন খান খান করে দেয়। হাসতে গিয়ে যে ভেঙে পড়ে অতি বাড়ন্ত লতার মতো; ভালো ছাড়া মুখে যার কিছু রোচে না ; পছন্দ না হলে, যত আদর করে দেওয়া হোক-না, সোনার জিনিসও যে পায়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়— সেই পটলি! সে নাকি তার জন্যে বসে আছে! সে আবার কারো সঙ্গে জুটে গিয়েছে। জুটবার লোকের অভাব নাই। তার বাড়ির পাশে বাবুভাই থেকে আরম্ভ করে কতজনই না ঘুরঘুর করত! কেবল তার অস্ত্র সেই মোটরের স্টার্টার লোহার ডাণ্ডাটার ভয়েই ঘুরঘুর করেও কেউ কিছু করতে পারেনি।

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠেছিল।

ফের—ফিন—ওই ডাণ্ডা ধরবে সে। কুছ পরোয়া নাই। যার যার কাছেই থাক-না পটলি একটি পাঁটখাঁটি খেয়ে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সে গিয়ে হাজির হবে। সে মরদই হোক ভাগে ভালা না হলে মারবে ডাণ্ডা। পটলি চুলের মুঠি ধরে—!

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গিয়েছিল—গাঁয়ের বাউলদের কাছে শোনা একখানা গান—কেশে ধরে নিয়ে যাবে মিনতি কাহিনি শুনবে না।

সেই পটলি মরে গিয়েছে? দূষি ঘা হয়ে মরে গিয়েছে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। দূষি ঘায়ের আশ্চর্য কী? সে ছিল না, পেটের দায়ে পাপ করেছিল। না করেই বা খেত কী করে সে?

জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ চনচনে হয়ে উঠেছে। চারিপাশের মাঠ খাঁ খাঁ করছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। বোশেখ মাস থেকে জল নাই, মাঠে বীজধান পড়ে নাই। ইস্কাপনের শরীর জ্বলে যাচ্ছে যেন। চটচটে ঘামে সর্বাঙ্গ চটচটে হয়ে উঠেছে। সে আবার পা বাড়ালে গাঁয়ের দিকে।

যাক গে। পটলি মরেছে... কথা দুঃখেরই বটে— কিন্তু কী করবে সে? সে-ই যদি সেই রাত্রে গাছচাপা পড়ে মরত! কী হতো? পটলি তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই সাঙা করত! পটলি গিয়েছে, ঝিঙে আছে, উচ্ছে আছে, আবার কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে। বাঁচতে যখন হবে— তখন আর কী করবে? খেতেও হবে, ঘর বাঁধতে হবে, সবই করতে হবে। এবার সে মোটর চালানোর লাইসেন্স নেবে। হয়তো দেবে না পুলিশ সায়েব। না দেয় তাতেই

বা কী? ক্ষিতীশের মোটর ট্যাক্সিতে তো বাঁধা চাকরি তার। গাঁ থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ তাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে পাশে বসে ঘুমোবে, সে ছাড়বে গাড়ি।

গোঁ গোঁ করে ছুটবে গাড়ি। পায়ের রোঁয়াগুলো ঝলসে জলের অভাবে মরা বীজধানের চারার মতো শুকিয়ে খসে যাবে। রেডিয়েটারের ভেতর জল ফুটবে টগবগ করে। পিছনে উড়বে ধুলো, পাশে গাছপালা ছুটবে উলটোবাগে, পাশের দূরের গাঁ-গুলো ঘুরবে আস্তে আস্তে পাক দিয়ে।

এই কল্পনার ফলেই অকস্মাৎ একটা সজীবতার প্রবাহ বয়ে গেল ইস্কাপনের সমস্ত শরীরে, মনেও বয়ে গেল। তার চলার গতি দ্রুত হলো আপনা থেকেই। কয়েক পা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল; পিছন ফিরে চাইলে–যে পথে চলে গেছে সেক্রেটারি আর নোটন, সেইদিকে। তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। তবুও তার চোখ দুটো যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বললে–শালা!

বললে এই সেক্রেটারিকে। বলবে না? কী দোষ তার, ইস্কাপন সেক্রেটারির কী ক্ষতি করেছে যে, এত বড়ো কথাটা সে বললে? জেলের মধ্যে সে মরে গেলেই ভালো হতো? কই, সেক্রেটারিকে দেখে তার তো মনে হয় নাই– এই আট মাসের মধ্যে সেক্রেটারি মরে গেলে ভালো হতো।

ইস্কাপনের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল।

ঘরখানা শুধু নামেই দাঁড়িয়ে আছে।

চালে একমুঠো খড় নাই। বাখারিগুলোর অর্ধেক আছে অর্ধেক নাই। দেওয়ালের একটা দিক গোটাই পড়ে গিয়েছে। বাকি তিনদিকেরও ছয়-আনা গিয়েছে। দশ আনা আছে। দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে দাওয়ার ওপর; মাটিচাপা পড়ে আছে। ইস্কাপন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন বেশি মাটি কিছু চাপা পড়ে নাই, তবু দরজাজোড়াটা থাকল কী করে? হঠাৎ তার হাসি পেল। দরজাটাকে চাপা দিয়েছে যে মাটিটা–সেই মাটির ঢিপিতে একটা গর্ত, গর্তের মুখে একটা গোখরো সাপের খোলস। হরি হরি, ওইজন্য! সাপটাকে দেখতে না পেলেও সাপটাকে তার ভালো লাগল। ভালো সাপ। বেশ সাপ। সাপটাকে সে মারবে না। তাড়িয়ে দিলেই হলো। ঘরদোর পরিষ্কার করে থাকতে আরম্ভ করলেই ও পালাবে। আর দরজার মাটি খুঁড়তে গেলেই যদি বেরিয়ে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হলো, কালীমায়ের ডোম দেবাংশী যেমন একটা গোখরো পুষেছে তেমনই করে সাপটাকে ধরিয়ে ওর বিষদাঁত ভেঙে ওটাকে পুষলে কেমন হয়?

এই ইস্কাপন!

কে? ইস্কাপন ঘুরে দেখলে—তার জমিদারের লোক। জমিদার মানে—এই খানিকটা জমিরই মালিক শুধু। গেরস্ত ভদ্রলোক। তারই গোরুর রাখালটা এসে দাঁড়িয়েছে। ইস্কাপন ভুরু তুলে বললে, কী?

বাবু বললে তোমার ঘর বাবু অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে। এ ঘরে তুমি ঢুকো না।

দিয়ে দিয়েছে? অন্য লোককে? ঢুকব না ঘরে আমি?

হ্যাঁ। তা-ই বলে দিল বাবু।

ইস্কাপন হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ রাখালটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, শালা! শুয়ারের বাচ্চা! কী বললি? আমার বাড়ি আমি ঢুকব না?

লোকটা পিছু হাঁটতে শুরু করল—ওই তো আমি কী করব। বাবু বলে দিলে যে তোমাকে বলতে।

বাবু? ওরে শালা তুই এলি কেনে? তোমার বাবুকে মেরে তবে আমার অন্য কাজ। আমার ঘর, শুয়ারের বাচ্চা। ছোটোলোকের কুত্তা—

লোকটা ততক্ষণে পিছন ফিরে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটতে আরম্ভ করেছে। আগেকার কাল হলে এই দৃশ্য দেখে ইস্কাপন হো হো করে হাসত। কিন্তু আজ আর তার হাসি এল না। রাগে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। সে ছিল জেলে বন্দি হয়ে, তার এই অসময়ে তার ঘর, কত যত্ন করে ঘরখানি করেছিল, সেই ঘর তার অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে। ইস্কাপন কুড়িয়ে নিলে একটা মাটির ঢেলা। ছুড়লে বোঁ করে পলায়নপর রাখালটার দিকে। কিন্তু রাখালটার ভাগ্য ভালো। লাগল না তাকে। কিছুক্ষণ রাগে গুম হয়ে সে সেইখানে বসে রইল। তারপর উঠে চলল ক্ষিতীশের সন্ধানে। বেলা অনেক হয়েছে। খিদে পেয়েছে। রৌদ্রের মধ্যে যেন আগুনের আঁচ খেলে যাচ্ছে।

ইস্কাপনের মনে হলো এসব যেন একা তার ওপর অত্যাচার করবার জন্য হচ্ছে। এ রৌদ্রের এই আগুনের ঝলক—এ-ও তাদের মারবার জন্যে।

সেক্রেটারি তাকে বিনা কারণে বলে—লোকটা মরেনি কেন?

জমিদার তার বাড়ি কেড়ে নিয়েছে।

গাঁয়ের মাটি তার পায়ের তলায় তেতে জ্বলন্ত অঙ্গার উঠেছে। বাতাসে আগুনের আঁচ এসে তাকে দগ্ধাচ্ছে।

ক্ষিতীশের বাড়ি বন্ধ। মোটরের গ্যারাজটা ফাঁকা।

ক্ষিতীশ নাই। যুদ্ধের জন্যে পেট্রোল পাওয়া যায় না। ট্যাক্সি চালানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি বিক্রি করে ক্ষিতীশ চলে গিয়েছে এখান থেকে। ইস্কাপন